International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XI, Issue-VI, November 2025, Page No. 1-9
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.11.issue.06W.150

রবীন্দ্র দর্শনে অমঙ্গলের সমস্যা এবং তা থেকে উত্তরণের প্রয়াস: একটি ভিন্নমুখী বিশ্লেষণ

ড. অতসী মহাপাত্র

সহকারী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা গভর্ণমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ ফর উইমেন, চকশ্রীকৃষ্ণপুর কুলবেড়িয়া, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 05.11.2025; Accepted: 12.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract:

The problem of evil is an important issue in Philosophy as well as Theology. Atheists present such a problem against theists, the main point being that if God is perfectly good, then he must be willing to destroy evil; And if He is omnipotent, He will be able to destroy evil. But evil exists in the world. Evil is considered a problem only for those theists who believe in the existence of an all-powerful, omniscient and all-merciful God and also accept evil in the world. Indeed, the reconciliation of evil with an all-powerful and benevolent God is a religious and moral problem for theists. In modern times, some poet like philosophers have discussed evil. They have wanted to feel the evil through the perception and feelings of their hearts. Although the existence of evil was recognized in the literary world, it was not presented as a philosophical problem. Rabindranath Tagore also discussed the nature of evil and its significance in the world. The problem of evil in Tagore's philosophy is not expressed in this particular form. He said, evil has a real existence. Evil in human life becomes real evil only when it is experienced from the point of view of egoism. Abandoning this partial vision and accepting evil in the vision of the whole, the problem of evil is eliminated. This essay tries to discuss the problem of evil and its solution in the philosophy of Rabindranath Tagore.

Keywords: Egoism, Literary world, Partial vision, Philosophy of Rabindranath Tagore, Problem of evil

দর্শনশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রে অমঙ্গলের সমস্যা (The problem of Evil) হল একটি চিরায়ত সমস্যা। সাধারণভাবে জগতের বিচিত্র রূপের মধ্যে পাপ, দুঃখ, জরা, ব্যাধি, মানসিক বিপর্যয় ও মৃত্যুকে অমঙ্গল বলা হয়। যা কিছু মন্দ, অশুভ, ক্ষতিকর, অবাঞ্ছিত, বিরক্তিকর, দূষণীয় এবং মানবজীবনের মন্দ দিকগুলি প্রকাশ করে সেগুলিকে অমঙ্গল নামে অভিহিত করা হয়। এগুলি অবাস্তব কিংবা অলীক নয়, মানুষ তার জীবনের অন্যান্য সমস্যাগুলির মতো ব্যর্থতা, হতাশা, দুঃখ, বেদনা, মৃত্যু প্রভৃতিকেও বাস্তব জীবনে অনুভব থাকে। দর্শনের ইতিহাস তথা ধর্মতত্ত্বের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ঈশ্বরবাদ (Theism) অমঙ্গলের সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে। নিরীশ্বরবাদীরা ঈশ্বরবাদীদের বিরুদ্ধে এরূপ সমস্যার কথা উপস্থাপিত করে থাকেন, এর মূল বক্তব্য হল ঈশ্বর যদি পরিপূর্ণভাবে মঙ্গলময় হয়ে থাকেন, তবে তিনি নিশ্চয় অমঙ্গলের বিনাশ সাধন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করবেন; এবং তিনি যদি সর্বশক্তিমান হন, তবে তিনি অমঙ্গলের বিনাশ সাধন করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু জগতে অমঙ্গলের অস্তিত্ব রয়েছে। সুতরাং ঈশ্বর কখনোই একই সঙ্গে সর্বশক্তিমান এবং মঙ্গলময় হতে পারেন না।[১] ভিন্ন ভাষায় বলা যায়, তিনি সর্বশক্তিমান নন বলে অমঙ্গল দূর করতে পারেন না, না হয় তিনি মানুষকে ভালোবাসেন না, অর্থাৎ মঙ্গলময় নয় বলেই মানুষের মঙ্গলসাধন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যারা সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ ও পরমকরুণাময় ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানেন এবং সেই সঙ্গে জগতে

অমঙ্গলকেও স্বীকার করেন, কেবলমাত্র সেইসব ঈশ্বরবিশ্বাসীদের কাছে অমঙ্গল একটি সমস্যা রূপে পরিগণিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, সর্বক্ষম এবং মঙ্গলময় ঈশ্বরের সঙ্গে অমঙ্গলের সংগতিবিধান হল মঙ্গলময় ঈশ্বরবিশ্বাসীদের কাছে একটি ধর্মীয় ও নৈতিক সমস্যা। আধুনিককালে দার্শনিকের মতো সাহিত্যিকরাও অমঙ্গল সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। কবি সাহিত্যিকরা আপন অন্তরের উপলব্ধি তথা অনুভূতির মাধ্যমে অমঙ্গলকে অনুভব করতে চেয়েছেন। অমঙ্গলের সমস্যা ও তার সমাধান কিভাবে সম্ভব তা নিয়ে দার্শনিক ও সাহিত্যিকদের মধ্যে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্যের জগতে অমঙ্গলের অস্তিত্ব স্বীকৃত হলেও তা দার্শনিক সমস্যা রূপে উপলব্ধ হয়নি। আধুনিককালের বিশেষত বিংশ শতাব্দীতে বিশিষ্ট কবি দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও অমঙ্গলের স্বরূপ এবং জগৎ ও জীবনে অমঙ্গলের তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরবাদীদের মতো প্রেমময় দেবতারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানেন এবং সেই সঙ্গে এই জগতে অমঙ্গলকেও অভিজ্ঞতা রূপে স্বীকার করেন। আলোচ্য প্রবন্ধে অমঙ্গলের সমস্যা ও তার সমাধান প্রসঙ্গে রবীন্দ্র মননে কিরূপ উপলব্ধি ছিল সে সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় বিভিন্ন প্রকার অমঙ্গলের অস্তিত্ব অনুভূত হয়। তবে, অমঙ্গল প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত প্রাকৃতিক অমঙ্গল (Natural Evil) এবং নৈতিক অমঙ্গল (Moral Evil)। প্রাকৃতিক অমঙ্গল বলতে প্রকৃতির সঙ্গে ব্যক্তির নিজের সমন্বয় সাধনের ব্যর্থতা বা অভাবকে বোঝায়। এই প্রকার অমঙ্গল ইচ্ছাকৃত নয়, অর্থাৎ এই প্রকার অমঙ্গল ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না, যেমন, ঘূর্ণিঝড়, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ভূমিকম্প, মৃত্যু, দুঃখ ইত্যাদি। কিন্তু নৈতিক অমঙ্গল মানুষের ইচ্ছা প্রণোদিত। এগুলি মানুষের স্বাধীনভাবে কর্ম সম্পাদনের উপর নির্ভরশীল। এই প্রকার অমঙ্গল উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানুষের ইচ্ছার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। উক্ত প্রকার অমঙ্গলের মধ্যে পার্থক্য হল- প্রাকৃতিক অকল্যাণ মানুষের ইচ্ছা বহির্ভূত। মানুষের নিয়ন্ত্রণের অতীত। কিন্তু নৈতিক অমঙ্গল মানুষের দ্বারা স্বেচ্ছায় সম্পাদিত হয় বলে এর প্রতি মানুষের নিয়ন্ত্রণ থাকে। তবে কোনো কোনো চিন্তাবিদ উক্ত প্রকার সরলীকৃত পার্থক্য স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, এমন কিছু অমঙ্গল আছে যা প্রাকৃতিক এবং নৈতিক উভয়ই। যেমন, হত্যাকান্ড। এটি একদিকে যেমন প্রাকৃতিক, তেমনি অন্যদিকে নৈতিকও। আবার পাশ্চাত্য দর্শনে লাইবনিজ এই প্রকার পার্থক্য অস্বীকার করে প্রাকৃতিক ও নৈতিক অমঙ্গলকে অধিবিদ্যক বা পরাতাত্ত্বিক অমঙ্গল (Metaphysical Evil) নামে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে,

> "Metaphysical evil is absolutely unavoidable, if a world is to exist at all; created beings without imperfection, finiteness, limitation, are entirely inconceivable– something besides gods must exists."[২]

প্রাকৃতিক ও অনৈতিক অমঙ্গলের আবির্ভাব নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতান্তর পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীনকালে ধর্মতত্ত্ববিদগণ মনে করেন, নৈতিক অমঙ্গল প্রাকৃতিক অমঙ্গলের পূর্ববর্তী। তাঁদের মতে, নৈতিক নিয়ম লঙ্ঘন করে পাপ কাজ সম্পাদন করলে শাস্তিপ্রদানের জন্য পরবর্তীকালে মানবসমাজে প্রাকৃতিক অমঙ্গলের আবির্ভাব ঘটে। এই অর্থে নৈতিক অমঙ্গল প্রাকৃতিক অমঙ্গলের পূর্ববর্তী। কোন কোন ধর্মে এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। তবে, কোন কোন দার্শনিক এই ধরনের বক্তব্য সমর্থন করেন না। তাঁদের মতে, মানবসমাজে পাপের ধারণা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনেক পূর্বেই বিশ্বে প্রাকৃতিক অমঙ্গলের অস্তিত্ব বর্তমান ছিল। তাছাড়া বিশ্বের গঠন বিন্যাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পাপের ধারণা তৈরীর অনেক পূর্বে জাগতিক প্রাকৃতিক অমঙ্গল মানবসমাজকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, দুঃখ, হতাশা প্রভৃতি জাগতিক অমঙ্গল জগতের গঠন প্রক্রিয়ার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। বিশ্বপ্রকৃতি হল প্রাকৃতিক অমঙ্গলের ধারক ও বাহক। এগুলিকে কোনোভাবেই মনুষ্য সমাজ থেকে পৃথক করা যায় না। প্রকৃতি এমন সব জীবাণু সৃষ্টি করেছে, যেগুলি মানুষের রোগ ও মৃত্যুর কারণ, তাছাড়া, কিছু কিছু লোকের কল্যাণের জন্য অন্য ধরনের জীবের দুঃখ ও মৃত্যু ঘটে থাকে। সর্বোপরি, প্রাকৃতিক নিয়মগুলিও নানান ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি করে। ফলে এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে, এইসব জাগতিক অমঙ্গলগুলি কার কল্যাণের জন্য ঘটে থাকে? ঈশ্বর যদি মঙ্গলময় হয়ে থাকেন, তবে তাঁর সৃষ্টিও মঙ্গলময় হবে, কিন্তু বাস্তবে এর বিপরীত লক্ষ্য করা যায় কেন? বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করে বলা যায়, যে সব ঐতিহাসিক ধর্মে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে, সেই সকল ধর্মীয় শাস্ত্রগুলিতে ঈশ্বরকে জগতের স্রষ্টা ও সংহারক রূপে অভিহিত করা হয়। তিনি হলেন সর্বশক্তিমান, সকল প্রকার কল্যাণ গুণের আধার, সর্বজ্ঞ এবং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা। অথচ ঈশ্বর সৃষ্ট জীব জগতে দুঃখ কষ্টের অন্ত নাই। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যন্ত্রণা, মানসিক ব্যাধি, আত্মীয়

পরিজনের মৃত্যু প্রভৃতি নানা দুঃখকষ্ট মানুষের মনকে বিচলিত করে তোলে। ফলে স্বভাবতই মানুষের মনে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, সর্বশক্তিমান মঙ্গলময় ঈশ্বরের রাজ্যে তথা সৃষ্ট জগতে এত অমঙ্গল কেন? তবে কি ঈশ্বর বলে কেউ নেই অথবা তাঁর সম্বন্ধে তার ভক্তরা যে সব কথা বলে থাকেন সে সবই মিথ্যা? এই প্রকার সমস্যাই সাধারণভাবে অমঙ্গলের সমস্যা নামে পরিচিত।

অমঙ্গলের সমস্যাটির জটিলতা ও গভীরতার কারণেই যুগে যুগে বিভিন্ন দার্শনিক নিজ নিজ দার্শনিকতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে অমঙ্গলের সমস্যাটির স্বরূপ ও সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেছেন। যেমন, জড়বাদ (Materialism) ও প্রকৃতিবাদ (Naturalism) অনুসারে, অমঙ্গলের সমস্যার কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই। এই জগতে যা কিছু ঘটছে, সে সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে চালিত অসংখ্য অচেতন পরমাণুর ঘাত প্রতিঘাতের ফল। বিশ্বজগৎ হল অন্ধশক্তির দ্বারা চালিত। জগতে যা কিছু ঘটে চলেছে, সবকিছু সম্পর্কে মানুষ সচেতন নয় বলে দুঃখ কষ্টের কারণ খুঁজে চলেছে। প্রকৃতপক্ষে, মানুষ কেন দুঃখ কষ্টভোগ করে, সে সম্পর্কে নিয়মিতভাবে কারণ খোঁজার চেষ্টা সময় এবং পরিশ্রমের অপব্যবহার ছাড়া আর কিছু নয়। আবার বহুদেবতাবাদ (Polytheism) ও অপদেবতাবাদে (Paganism) বিশ্বাসীরা মনে করেন, সাধারণভাবে, অমঙ্গলের প্রশ্ন জগৎ সম্বন্ধে কোন সমস্যা সৃষ্টি করে না। তাঁদের মতে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দেবতারা মানুষকে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য প্রদান করে থাকেন। তাই, অমঙ্গলের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার কোন প্রয়োজন নেই। স্তব, স্তুতি, মন্ত্র, পূজার্চনা দিয়ে এই সব দেবতা ও অপদেবতাকে সন্তুষ্ট রাখাই হল বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। কিন্তু ঈশ্বরকে যখন সর্বশক্তিমান, সুবিচারক, ন্যায়ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা, সকল প্রকার কল্যাণগুণের আধার বলে মনে করা হয়, তখন অমঙ্গলের সমস্যাটি অপরাপর সমস্যার মতো গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা দেয়।

একইভাবে বহুদেবতাবাদ অনুযায়ী মনে করা হয়, বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির পশ্চাতে একাধিক অতীন্দ্রিয় অতিমানব দেবতার অস্তিত্ব রয়েছে, এদের মধ্যে যে সব প্রাকৃতিক শক্তি মানুষের দুঃখ কষ্টের কারণ ও প্রাকৃতিক নিয়মের অমঙ্গলের হেতু, সেগুলি কতকগুলি অশুভ দেবতার নিয়ন্ত্রণের অধীন। আবার দ্বি-ঈশ্বরবাদে (Di-theism) দুটি স্বতন্ত্র দেবতা বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। এর সাহায্যে অমঙ্গলের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এই দুটি ঈশ্বর স্বতন্ত্র এবং তারা পরস্পর বিরোধী। একটি হল শুভ, মঙ্গল এবং কল্যাণের স্রষ্টা। অপরটি হল অশুভ, অকল্যাণ এবং অমঙ্গলের স্রষ্টা। মঙ্গলময় ঈশ্বর একটি সর্বাঙ্গসুন্দর জগৎ সৃষ্টি করতে আগ্রহী হলেও প্রতিদ্বন্দ্বী ঈশ্বরের জন্য তা সম্ভব হয় না। এই কারণে জগতে অমঙ্গলের অস্তিত্ব রয়েছে। একইভাবে প্রাচীন পার্শীদের মতবাদে তথা প্রাচীন পার্শী ধর্মমতের মধ্যেও অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে। যে ঈশ্বর কল্যাণের প্রতীক তাকে 'আহুরা মাজদা' এবং যে ঈশ্বর অমঙ্গলের স্রষ্টা তাকে 'আর্হিমন' নামে অভিহিত করা হয়। উভয়ের পারস্পরিক ক্রিয়া ও দ্বন্দ্ব থেকে এই জগতে শুভ এবং অশুভ সৃষ্টি হয়েছে। শুধু তাই নয়, খ্রিস্টধর্মেও অমঙ্গলের ব্যাখ্যা হিসেবে হিতৈষী ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে শয়তানের কল্পনা করা হয়েছে। এই মতে, শয়তান হল অমঙ্গলজনক এবং বিঘ্নকারী শক্তি, যার থেকে সব অমঙ্গল ও পাপের সৃষ্টি হয়েছে।

আবার, পাশ্চাত্য দর্শনে ভাববাদী দার্শনিক প্লেটো (Plato) বলেন, যে সব জড় উপাদান থেকে জগতের সৃষ্টি তাই হল অমঙ্গলের কারণ। এই মতে, চরম মঙ্গলের ধারণাকে (The Idea of Good) কখনো কখনো ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন কখনো বা ঈশ্বর থেকে ভিন্ন বলে দাবি করা হয়। বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা থেকে এই ধারণার জ্ঞান লাভ করা যায়। ধারণার জগতে কেবল ঐক্য, সংগতি, সামঞ্জস্য, শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য বিরাজমান হলেও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে সেগুলির অভাব যথা অসত্য, বিশৃঙ্খলা, কুশ্রীতা বিদ্যমান। তাই প্লেটোর মতে, প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে, কেবলমাত্র জড় জগতের মধ্যে যাবতীয় অকল্যাণ বিদ্যমান। কিন্তু বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে, বা প্রত্যয়ের জগতে অকল্যাণ বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। পরবর্তীকালে, মধ্যযুগীয় দার্শনিক প্লটিনাস (Plotinus) প্লেটোকে অনুসরণ করে অকল্যাণকে জড়ের সঙ্গে সংযুক্ত করে বলেন, জড় হল যাবতীয় অকল্যাণের একমাত্র উৎস। আবার, কোন কোন মতবাদে লক্ষ্য করা যায়, যেগুলিতে অমঙ্গলের যথার্থ সমস্যাকে ব্যাখ্যা না করে সমস্যাটিকে এড়িয়ে যেতে চায়। এই সকল মতবাদ অনুসারে মনে করা হয়, পরম দৃষ্টিতে প্রাকৃতিক কিংবা নৈতিক উভয় প্রকারের অমঙ্গলের যথার্থ কোন অস্তিত্ব নেই, আবার কোন কোন মতবাদে অমঙ্গলের সমস্যাটি এড়িয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে অমঙ্গলকে বিশ্বের মৌলিক উপাদান রূপে গণ্য করা হয়; এবং দাবি করা হয় মঙ্গল এবং অমঙ্গল হল সমশ্রেণীভুক্ত। কেউ কেউ কট্টর ধর্মবিরোধী হয়েও অমঙ্গলের বাস্তবতার স্বীকার করেন। আবার কেউ কেউ আস্তিক্যবাদী হয়েও অমঙ্গলের বাস্তবতা অস্বীকার করেন। এই প্রসঙ্গে মধ্যযুগীয় দার্শনিক

সেন্ট অগাস্টিনের অভিমত উল্লেখযোগ্য, তিনি মনে করেন, পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তার সবই মঙ্গল- সবকিছুই শুভ। অকল্যাণকর বলে অন্য কিছু পৃথিবীতে নেই। যে অবস্থাকে অশুভ বা অকল্যাণজনক বলে মনে করা হয়, তাহলে প্রতিভাস মাত্র। এর কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই। এই বিশ্বজগৎ হল মঙ্গলময়।

পরবর্তীকালে সর্বেশ্বরবাদী (Pantheist) দার্শনিক স্পিনোজা মনে করেন, এই জগতের তথাকথিত অমঙ্গলগুলি মূলত অবাস্তব। এদের কোন প্রকৃত সত্তা নেই। পারমার্থিক দৃষ্টিতে এগুলি ভ্রম; যদিও বাস্তব দৃষ্টিতে এগুলি সত্যতা প্রতীয়মান হয়। তাঁর মতে, অসীম দ্রব্য ঈশ্বর হলেন একমাত্র সত্তা। তিনি হলেন ভালো-মন্দের অতীত। মঙ্গল এবং অমঙ্গল যেহেতু মনোগত ধারণা, সেহেতু পূর্ণসত্তা ঈশ্বরের ক্ষেত্রে তা আরোপ করা যায় না। ঈশ্বরের মধ্যে কোন অমঙ্গল বা অসংগতি থাকে না। স্পিনোজার মতে, ভালো-মন্দের ধারণা হল ভ্রমাত্মক। যেহেতু সকল সান্ত বস্তু তথা সীমিত সত্তা হল এক পরম দ্রব্য ঈশ্বরের প্রকাশ, সেহেতু বাস্তবে ভালো-মন্দের কোন অস্তিত্ব নেই। আবার, দার্শনিক হেগেলের মতেও অমঙ্গলের কোন যথার্থ সত্তা নেই। অমঙ্গল অবাস্তব। আংশিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অমঙ্গলকে বাস্তব বলে মনে করা হয়। কিন্তু সামগ্রিক দৃষ্টি থেকে বিচার করলে অমঙ্গলের কোন যথার্থ অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। তাঁর মতে, যেহেতু সমগ্র বিশ্বজগৎ সংগঠনের দিক থেকে বৌদ্ধিক এবং যেহেতু অমঙ্গল হল অবৌদ্ধিক সেহেতু অমঙ্গল প্রাতিভাসিক, যথার্থ নয়। তিনি বলেন, পাপ হল ইচ্ছার ব্যাপার। সীমিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যা অমঙ্গল বলে মনে হয়, তা হল অমঙ্গল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই অমঙ্গল সম্পর্কে ব্রাডলি (Bradley) এবং বোসাঙ্কয়েট (Bosanquet) এর দৃষ্টিভঙ্গি হেগেলের অনুরূপ। এইসব মতবাদ অনুসারে দাবি করা হয়, সংকীর্ণ দৃষ্টির জন্যই মানবসমাজে যাবতীয় জাগতিক ও নৈতিক অমঙ্গলের ধারণার উৎপত্তি হয়েছে। প্রকৃত অর্থে অমঙ্গল বলে কিছু নাই।

প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে সাংখ্য দার্শনিকরা জড় (প্রকৃতি) এবং চেতন (পুরুষের) মধ্যে দ্বৈতসত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তবে সাংখ্য দর্শনের ঈশ্বর স্বীকৃত নয়। তাঁদের মতে, পুরুষ হল নিত্য, শুদ্ধ, মুক্তসত্তা। প্রকৃতি অচেতন এবং পরিবর্তনশীল শক্তি। প্রকৃতি হল জগৎ বৈচিত্রের মূল কারণ। তাই, দুঃখ-কষ্ট, হতাশা, ব্যর্থতা ত্রিতাপসহ যাবতীয় অকল্যাণের আবাসভূমি হল প্রকৃতি। পুরুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে ভেদজ্ঞানের অভাব হল পুরুষের দুঃখ-কষ্টের মূল কারণ। প্রকৃতি আছে বলেই পুরুষ নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করে এবং দুঃখের দ্বারা অভিভূত হয়। এইভাবে দ্বৈতবাদী সাংখ্য দর্শনে অমঙ্গলের সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। অদ্বৈতবাদী চিন্তাধারার প্রবর্তক আচার্য শঙ্করের মতে, ব্রহ্ম হল সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। কিন্তু অবিদ্যা বা মায়ার প্রভাবে ব্রহ্ম নিজস্ব স্বরূপে প্রকাশিত হতে পারেন না। সেজন্য, প্রাতিভাসিক জগতকে দুঃখ দুর্দশা ও যাবতীয় অকল্যাণের আধার বলে মনে করা হয়। জীবাত্মা মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হলে জগতকে ব্রহ্মময় বলে মনে করে; এবং তখন অমঙ্গলের কোন অস্তিত্ব থাকে না। তাই অমঙ্গলের ধারণা এক্ষেত্রে অলীক ব্যতীত আর কিছু নয়। ভারতীয় বৌদ্ধদর্শনে মানব যন্ত্রণা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। গৌতম বুদ্ধের মতে, জীবন দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, প্রিয় বিচ্ছেদ দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, মৃত্যু দুঃখময়। মানবজীবন হল সীমাহীন বেদনায় ভারাক্রান্ত। এককথায় আসক্তিভিত্তিক সবকিছুই হল দুঃখপূর্ণ। এই দুঃখ থেকে মুক্তি অর্জন বা নির্বাণ লাভ হল বৌদ্ধ দর্শনের মূলকথা। তবে এই দর্শনে অমঙ্গলের অস্তিত্ব যেমন স্বীকৃত হয়, দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় এই দর্শনের নির্দেশিত হয়েছে। এইভাবে প্রায় সব ভারতীয় দর্শনে স্বীকার করা হয়, অবিদ্যা ও অজ্ঞতা হেতু জীবের দুঃখের উৎপত্তি ঘটে। তত্ত্বজ্ঞান বা যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা দূরীভূত হলে জীব দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করে থাকে। তাঁদের মতে, দুঃখ, কষ্ট ও অমঙ্গলের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অবাস্তব। এইসব মতবাদে অমঙ্গলকে বাস্তব বা সদর্থক হিসেবে গ্রহণ না করে অবাস্তব বা নঞর্থক রূপে গণ্য করা হয়; এবং দাবী করা হয়, অমঙ্গল হল মঙ্গলের অভাব কিংবা বলা যায় আংশিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অমঙ্গলের অস্তিত্ব রয়েছে। তবে, কোন কোন দার্শনিক অমঙ্গলের সমস্যাকে সার্বিক সমস্যা বলে অভিহিত করেছেন। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ম্যাকগ্রেগর তাঁর 'Introduction to Religious Philosophy' গ্রন্থে মঙ্গল বা কল্যাণের ধারণাকে এমন একটি বৃহত্তম ধারণা বলে চিহ্নিত করেছেন, যার মধ্যে অকল্যাণের ধারণাটিও অঙ্গীভূত।[৩]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ অমঙ্গল সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা পোষণ করেন। তিনি জীবনের ঘটনা হিসেবে অমঙ্গলের অস্তিত্বকে স্বীকার করতে দ্বিধা করেননি। রবীন্দ্র দর্শনের অমঙ্গলের সমস্যাটি এই বিশেষ প্রকারে প্রকাশিত হয় নি। তিনি যেহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং মানুষের চরম অভীষ্ট হিসাবে মুক্তি ও আনন্দকে নির্দেশিত

করেছেন সেহেতু রবীন্দ্র দর্শনে অমঙ্গলের সমস্যার সমাধান প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। তিনি বলেন, অমঙ্গলের বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অমঙ্গলের অস্তিত্ব হল একটি অনুভবসিদ্ধ ঘটনা। মানবজীবনে দুঃখকষ্ট একমাত্র অনুভূতি নয়, এর পাশাপাশি শুভ ও কল্যাণের অস্তিত্ব রয়েছে। বস্তুতপক্ষে সুখ ও প্রাণের অস্তিত্ব ছাড়া দুঃখ, কষ্ট ও অমঙ্গলের অস্তিত্ব কল্পনার অতীত। সুখ-দুঃখ, শুভ-অশুভ, জন্ম-মৃত্যু, পাপ-পুণ্য সবকিছুই হল পরস্পর সাপেক্ষ পদ। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি অর্থপূর্ণ হয় না। ভিন্নভাষায় বলা যায়, দুঃখ, হতাশা, কদর্যতা, ব্যর্থতা প্রভৃতির মতো সুখ, আনন্দ, সৌন্দর্য, সফলতা প্রভৃতির অস্তিত্বকে মানবজীবনে অস্বীকার করা যায় না। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

> "বিশ্বব্যাপী জন্ম-মৃত্যু সমুদ্র দোলায়,
> দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার-ভাঁটায়।"[৪]

এইভাবে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, বিশ্বজগতে অন্যান্য জাগতিক ঘটনার মতো মানুষের জীবন ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি নানা বৈপরীত্য দ্বারা গঠিত। এই বৈপরীত্যের উপাদান নিয়ে মনুষ্যজীবন অতীত থেকে শুরু করে বর্তমান পেরিয়ে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে। জগতের মধ্যে যা কিছু শুভ, সুন্দর ও প্রাঞ্জল রবীন্দ্র সাহিত্যে তার প্রকাশ ছিল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অক্লান্ত এবং অনবচ্ছিন্ন। ভাষা, ভঙ্গি ও অনুষঙ্গের নানা পরিবর্তন সত্ত্বেও এগুলির উপলব্ধি ছিল রবীন্দ্র দর্শনে স্বপ্রকাশিত। সর্বশক্তিমান মঙ্গলময় ঈশ্বরের সৃষ্টি অসম্পূর্ণ পারে না- এমনটা তিনি মনে করেন না; বরং তিনি মনে করেন, যেকোনো সৃষ্টি, সৃষ্টি হিসেবে অসম্পূর্ণ হতে পারে। এটি সীমিত অস্তিত্বের একটি ঘটনা বিশেষ। তাই অস্তিত্বকে কোনভাবেই অমঙ্গলজনক বলে গণ্য করা যায় না। অমঙ্গলকে বলা যায় অসম্পূর্ণতা এবং এটি তাই সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে; কারণ সৃষ্টি নিজেই হল ঈশ্বরের সীমাবদ্ধতা। ভিন্ন ভাষায় বলা যায়, সকল সৃষ্টসত্তা হল সীমিত। অমঙ্গল হল সীমিত সত্তার সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং অসম্পূর্ণ সৃষ্টির মধ্যে অমঙ্গলের অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী।

প্রকৃতপক্ষে, বিচ্ছিন্নতার মধ্যে মিলন, খন্ডের মধ্যে অখন্ডতা, আংশিক থেকে সমগ্রতায়, অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতার পথে অগ্রসরতা হল রবীন্দ্র দর্শনের মূলকথা। রবীন্দ্র মননে সীমা এবং অসীম উভয়ই হল একপাক্ষিক সত্য। উভয়ের সমন্বয়ে পরিপূর্ণ ঐক্যতে উপনীত হওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের মতে, মানুষ তার কর্মফল অনুযায়ী জীবন-মৃত্যুর নিয়ত ক্রমের মধ্য দিয়ে সুখ দুঃখের অভিজ্ঞতা লাভ করে পূর্ণতার পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে। তাঁর কাছে দুঃখ হল বিচিত্র, গভীর এবং বহুমুখী। দুঃখ হল আমাদের জীবনে একটি অকৃত্রিম অনুভূতি, যাকে বোঝা যায়, কিন্তু বোঝানো যায় না। যে দুঃখিত হয়, শোকার্ত হয়, যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়, একমাত্র সেই দুঃখের অনুভূতি বোঝে, সে দুঃখের পরিধি ও সীমারেখা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। রবীন্দ্রনাথ খন্ড খন্ড মৃত্যু নিয়ে গঠিত যে মৃত্যুর ধারাবাহিকতা, তার মধ্য দিয়ে নতুন এক উদ্ভাসিত জগতে তথা পূর্ণতার জগতে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে, দুঃখের চরম প্রকাশ ঘটে মৃত্যুতে। দৈহিক যন্ত্রণা, মানসিক দুঃখ-কষ্টভোগ এমনকি মৃত্যু মানুষের জীবনে এগুলির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে; কারণ এগুলি মানুষের জীবনে অবাঞ্ছিত ও অকাম্য হলেও বেঁচে থাকার জন্য প্রাণীর জীবনে অপরিহার্য। জীবনকে টিকিয়ে রাখার জন্য, উন্নত ও অলংকৃত করার জন্য অমঙ্গলের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। যেমন, দুঃখ-কষ্ট, মানসিক যন্ত্রণার উপলব্ধি হৃদয়হীন ব্যক্তিকে হৃদয়বান করে তোলে, নির্দয়কে সদয় করে তোলে, কঠোরকে নম্র করে, দুঃখের উপলব্ধির জন্য মানুষ প্রকৃত মানুষ রূপে চিহ্নিত হয়ে থাকে। দুঃখবোধের জন্যই মানুষের অন্তরে সমব্যথা ও সমবেদনা অনুভূতি জাগ্রত হয়। এমনকি মানসিক দুঃখবোধের জন্যই মানুষের সমগ্র চরিত্র উন্নত হয়, মানবিক ঐশ্বর্য সমৃদ্ধ হয়। তাই তিনি বলেছেন,

> "আমার এ ধুপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে
> আমার এ দীপ না জ্বালালে দেয় না কিছুই আলো"[৫]

এইভাবে দুঃখের দহন জ্বালাতে জীবন শুদ্ধ হয়, পবিত্র হয়, জীবন উন্নততর হয়ে বিকশিত হয়; এবং ধন্য হয়। রবীন্দ্রনাথ দুঃখের স্বরূপ ব্যাখ্যায় বলেছেন "দুঃখের যত প্রকার ব্যাখ্যা করি না কেন দুঃখ তো দুঃখ থাকিয়া যায়। না থাকিয়া যে জো নাই। দুঃখের তত্ত্ব আর সৃষ্টিতত্ত্ব যে একেবারে একসঙ্গে বাঁধা; কারণ অপূর্ণতাই তো দুঃখ এবং সৃষ্টি যে অপূর্ণ।"[৬] এইভাবে তিনি মানবজীবনে দৈহিক যন্ত্রণা, মানসিক কষ্ট এবং দুঃখের বাস্তবতা স্বীকার করেন। তবে তিনি এগুলিকে নিষ্প্রয়োজনীয় বলে মনে করেননি। দুঃখের ভিতর দিয়ে মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে থাকে।

মানুষের জীবনের জন্য যেমন বায়ু আবশ্যক, তেমনি মানুষের মনুষ্যত্বের জন্য সেইরূপ দুঃখের প্রয়োজন রয়েছে।[৭] রবীন্দ্রনাথ দুঃখ, কষ্ট ও মানসিক বেদনার মতো মানুষের জীবনে মৃত্যুর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। মানসিক উৎকর্ষসাধন ও অগ্রগামিতা জন্য মৃত্যু প্রয়োজন। মানুষের মৃত্যু অসম্ভব হলে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠত অর্থাৎ যদি মৃত্যুর ঘটনা না ঘটত, তবে সকল মানুষ বস্তু, বিষয় সবকিছুই চিরকাল অস্তিত্বশীল হয়ে থাকত, পৃথিবী জড়ে ভরে যেত, হয়তোবা জীবনটা নরকে পরিণত হত। সেজন্য তিনি যা কিছু ব্যর্থতা, আবর্জনা সবকিছু দূর করে নতুনকে আহ্বান জানিয়েছেন। তাই তিনি বলেছেন, "ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো।"[৮] তাছাড়া, যদি একমাত্র জন্মই থাকত এবং মৃত্যু যদি না ঘটত, তবে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান সবকিছুর অপ্রতুলতা জীবনে সংকট সৃষ্টি করত। প্রাচীনের তিরোধান এবং নবীনের আবির্ভাব বিবর্তনের গতি প্রক্রিয়াকে অগ্রসর করে তোলে, তা না হলে সমগ্র জীবন প্রবাহের গতি রুদ্ধ হয়ে পড়ত।

এইভাবে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান দুঃখ, যন্ত্রণা, মানসিক কষ্ট এবং মৃত্যু মানুষের জীবনে কাম্য না হলেও অপেক্ষাকৃত উন্নততর জীবনলাভের জন্য এগুলির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতে হয়। তাই মনুষ্যজীবনে দুটি চরম অমঙ্গল হল দুঃখ ও মৃত্যু, যা মানুষের দেহাস্তিত্বের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত; যদিও এর পারমার্থিক অস্তিত্ব নেই। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আত্মপরিচয়ে বলেন, "মানুষ যখন ছোট আমিকে নিয়ে চলে তখন মৃত্যু ভয় দেখায়, ক্ষতি বিমর্ষ করে, তখন বর্তমান ভবিষ্যৎকে হনন করতে থাকে, দুঃখশোক এমন একান্ত হয়ে ওঠে যে তাঁকে অতিক্রম করে কোথাও সান্ত্বনা পাইনে।"[৯] মানুষের সমস্ত জীবন একটি আবর্তের মধ্য দিয়েই প্রবাহিত হয়ে চলেছে। মানুষ একদিকে অন্ধকার বিভীষিকা, মোহ অর্থাৎ ক্ষুদ্রতাকেই কেবল জানতে পারে কিন্তু সেই জানার সঙ্গে যখন সে অমৃতের উৎসকে জানতে পারে তখন অসত্য থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে আলোতে উত্তীর্ণ হওয়ার চেষ্টা করে। এইভাবে মানুষ সকল প্রকার বন্ধনকে অতিক্রম করে মুক্তির স্বাদ পেতে পেতে তথা অমৃতের পাথেয় সংগ্রহ করতে করতে চিরজীবনের পথে অগ্রসর হতে পারে। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখকে বিশ্বব্যাপী নিয়ম শৃঙ্খলার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ ক্ষণিকত্বদবাদের বক্তব্য সমর্থন করে জগৎ ও জীবনে সুখ দুঃখকে ক্ষণিক ও পরিবর্তনশীল বলে চিহ্নিত করলেও ক্ষণিক জীবনকেই একমাত্র সত্য বলে মনে করেন নি। তিনি চিরজীবনের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করেন। তাঁর মতে,

> "জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখকে যখন বিচ্ছিন্নভাবে দেখি, তখন আমাদের ভিতরকার এই অনন্ত সৃজনরহস্য ঠিক বুঝতে পারিনে। প্রত্যেকটা পদ বানান করে পড়তে হলে যেমন সমস্ত বাক্যটার অর্থ এবং ভাবের ঐক্য বোঝা যায় না সেই রকম। কিন্তু নিজের ভিতরকার এই সৃজন ব্যাপারের অখন্ড ঐক্যসূত্র যখন একবার অনুভব করা যায় তখন এই সর্জ্যমান অনন্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে নিজের যোগ উপলব্ধি করি।"[১০]

নিজের প্রবহমান জীবনকে যখন নিজের বাইরে নিখিলের সঙ্গে যুক্ত করে দেখা যায়, তখন জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখগুলিকেও একটা বৃহৎ আনন্দের সূত্রে উপলব্ধি করা সম্ভব। তবে তিনি কখনোই ভারতীয় দার্শনিকদের মতো জগৎ ও জীবনকে দুঃখময় বলেন নি। তাঁর মতে, দুঃখের উৎস হল জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা। তাই জীবন ও মৃত্যুর আলোচনায় রবীন্দ্র দর্শনে সুখ দুঃখের অনুভূতি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ দাবী করেন দুঃখ ও মৃত্যুর আঘাতেই মানুষের চেতনার বন্ধন ছিন্ন হয়ে ভূমাবোধে প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটে।

তিনি মনে করেন, অমঙ্গল তখনই সমস্যা রূপে প্রকাশিত হয়, যখন আমরা একে অস্তিত্বের একটি চরম ও স্থায়ী পরিণতি হিসেবে মনে করে থাকি অর্থাৎ অমঙ্গল রয়েছে একথা রবীন্দ্র ভাবনায় উপলব্ধ সত্য হলেও তাকে স্থায়ী ও চরম সত্য বলে স্বীকার করা হয় না। সেজন্য সৃষ্টির সীমিত প্রকাশ হিসেবে অমঙ্গলকে সত্য ও বাস্তব বলে স্বীকার করে নিয়ে তাকে অতিক্রম করে যাওয়ার কথা রবীন্দ্র দর্শনের ঘোষিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি 'Sadhana'তে বলেছেন,

> "Evil cannot altogether arrest the course of life on the highway and rob it of its possessions. For the evil has to pass on, it has to grow into good; it cannot stand and give battle to the all."[১১]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে 'অতিক্রম করে যাওয়া'র অর্থ 'বর্জন করা' বা 'অস্বীকার করা' নয়। এইভাবে রবীন্দ্রভাবনায় অমঙ্গল কোন অলীক কিংবা অবাস্তব কোন কিছু নয়। বরং এক্ষেত্রে অমঙ্গলের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে। তাঁর মতে,

অমঙ্গল হল ঘটনাবিশেষ, কিন্তু তা চরম ঘটনা নয়। এটা একটা পর্যায় মাত্র। এই প্রসঙ্গে বিনয় গোপাল রায় বলেছেন, "Evils and sufferings are not ultimate, but for the finites, they do exist."[১২] এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ প্রতিমা দেবীকে লিখিত চিঠিতে বলেন, "জীবনের সঙ্গে মৃত্যুকে মিলিয়ে না দেখলে সত্যকে দেখা হয় না। আমরা প্রতিদিন জীবনকে যখন উপলব্ধি করি, তখন মৃত্যুকে তার অঙ্গ বলে উপলব্ধি করিনে বলে আমাদের প্রবৃত্তি দিয়ে সংসারটাকে আঁকড়ে থাকি, বাসনা আমাদের ভয়ানক বন্ধন হয়ে ওঠে। মৃত্যুর সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেখলে সংসারের ভার হালকা হয়ে যায়। আবার যখন মৃত্যুকে দেখি, তখন জীবনকে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখিনে বলেই শোকের জ্বালা প্রচন্ড হয়ে ওঠে। মৃত্যু জীবনকেই বহন করে, জীবন মৃত্যুর প্রবাহেই এগিয়ে চলেছে এই কথাটি ভালো করে বুঝে দেখলে সত্যের মধ্যে আমাদের মন মুক্ত হয় এবং উপলব্ধি করা যায় পূর্ণসত্যের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। জীবন ও মৃত্যুকে একান্ত বিরুদ্ধ বলে জানলেই আমাদের মোহ জন্মায়, সেই মোহ আমাদের বাঁধে, সেই মোহ আমাদের কাঁদায়। যত পাপ যত ভয়, যত শোক ওইখানেই।"[১৩]

তাঁর মতে, অমঙ্গলকে মঙ্গলের বিরুদ্ধ হিসেবে কিংবা জীবনকে মৃত্যুর অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণতার বিরুদ্ধ হিসেবে উপস্থাপন করা যায় না; কারণ এক্ষেত্রে অমঙ্গল চরম হিসেবে প্রতিপন্ন হয়ে থাকে। এই অমঙ্গলকে যখন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়, এমনকি অমঙ্গলকে যখন বিচ্ছিন্ন ও একক ঘটনা হিসেবে দাবি করা হয়, তখন একথা মনে করা হয় এটি চরম এর কোনো শেষ নেই। এরূপ ক্ষেত্রে অমঙ্গল একটি সমস্যা হিসেবে প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু অমঙ্গলকে যদি সমগ্রের সঙ্গে যুক্ত করে অনুভব করা হয়, তবে সেটি আর পরিপূর্ণতা বা মঙ্গলের অস্বীকৃতিকে বোঝায় না, বরং অমঙ্গল এক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা অথবা মঙ্গলে পৌঁছানোর একটি পর্যায়ে হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়, "ফুরায় যা তা ফুরায় শুধু চোখে"[১৪] তাঁর মতে, অমঙ্গল হল সীমিত সত্তার কাছে একটি সাময়িক অনুভূতি মাত্র। এটি মানুষের কাম্য বা লক্ষ্যবস্তু হতে পারে না। আনন্দই হল মানুষের জীবনে পরমকাম্য বিষয়। তাই তিনি 'Sadhana' তে বলেছেন,

> "Pain, which is the feeling of our finiteness, is not a fixture in our life. It is not an end in itself, as joy is. To meet with it is to know that it has no part in the true permanence of creation."[১৫]

তিনি উপমা ব্যবহার করে বলেন, একটি ছোট্টশিশু যখন প্রথম হাঁটতে শেখার চেষ্টা করছে, তখন সে বারবার পড়ে যাচ্ছে, এমনকি এই দৃশ্যটি আমাদের কাছে নির্মম ও পীড়াদায়ক কিন্তু আমরা যদি শিশুটির পড়ে যাওয়া, আঘাত পাওয়া সবকিছু অসফলতাকে তার হাঁটতে শেখা তথা সাফল্যের একটি পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ করে থাকি, তবে শিশুটির হাঁটতে গিয়ে পড়ে যাওয়া দৃশ্যটি নির্মম না হয়ে আনন্দের উৎস হয়ে দাঁড়ায়। একইভাবে, আংশিক বা বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যদি মানুষকে প্রত্যক্ষ করা হয়, তখন মানবজীবনের জরা, ব্যাধি, মানসিক বিপর্যয়, কষ্ট এমনকি মৃত্যু আমাদের পীড়িত করে, ব্যথিত করে তোলে। দুঃখের চরম পরিণতি মৃত্যু 'জীবনের সর্বশেষ পরিণতি' হিসেবে চিহ্নিত হয়। এককথায় বলা যায়, দুঃখ-কষ্ট, মৃত্যু বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে অমঙ্গলজনক রূপে প্রতিপন্ন হয়। এইভাবে কদর্যতা, বিরোধ, দুঃখ-কষ্ট, মৃত্যু যা কিছু অমঙ্গল, সবকিছুকে বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে গ্রহণ করা হয় বলে অমঙ্গল সমস্যা রূপে আবির্ভূত হয়। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের ঋষিদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বলেন যে, বিশ্বজগতের মধ্যে অপ্রমেয় ধ্রুব রয়েছেন। তিনি বাহ্যত একভাবে কোথাও প্রতিভাত হন না। মানবমনই নানার মধ্যে এককে দেখে, সেই এককে প্রার্থনা করে, সেই এককে আশ্রয় করে আপনাকে চরিতার্থ করে। নানার মধ্যে সেই এককে না পাইলে মনে সুখ শান্তি থাকে না। সেই ধ্রুব একের সাথে মন আপনাকে দৃঢ় ভাবে সংযুক্ত করতে না পারলে যে, সে অমৃতের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না। সে খন্ড খণ্ড মৃত্যুর দ্বারা আহত, তাড়িত ও বিক্ষিপ্ত হয়ে বেড়ায়। সকল প্রকার অমঙ্গলকে পারমার্থিক দৃষ্টিতে অনুভব করলে অমঙ্গলের অস্তিত্ব অনুভূত হলেও তা কোন সমস্যা হেতু হয় না। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত শোক দুঃখ এমনকি মৃত্যুশোক থেকে পরিত্রাণ হেতু ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। আনন্দময় ঈশ্বরের সঙ্গে কবির আত্মিক মিলন সাধিত হওয়ায় শোক, দুঃখ, বেদনা, মৃত্যু সবই নতুন রূপে তাঁর দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছে। তিনি অপূর্ণতার মধ্যে পূর্ণতার প্রকাশ উপলব্ধি করেছেন, দুঃখের ভিতরে আনন্দের প্রকাশ অনুভব করেছেন। তাঁর মতে, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু সব কিছুই মরীচিকার মতো। একমাত্র সত্য হল নিঃশেষ চিরনবীনতা কোন ক্ষতি যাকে স্পর্শ করতে পারে না। জীবনের

কোন কিছু ফুরায় না, শুধুমাত্র অবস্থান্তর ঘটে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে, ক্ষণিক জীবনের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে চিরজীবনে উন্নীত হওয়ার কথা ঘোষিত হয়েছে রবীন্দ্র দর্শনে। তাই তিনি বলেছেন,-

"আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবুও অনন্ত জাগে।"[১৬]

প্রকৃতপক্ষে উপনিষদীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জগতের সর্বত্র আনন্দময় ঈশ্বরের প্রকাশ অনুভব করেছেন। উপনিষদে বলা হয়েছে, "মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ"[১৭] অর্থাৎ উপনিষদের ঋষিরা অনুভব করেছেন, বাতাস মধুময়, নদী মধুময়, সিন্ধু মধুময়, সমগ্র বিশ্ব মধুময়- আনন্দময়। জগতের কোথাও অমঙ্গলের অস্তিত্ব নেই। একইভাবে রবীন্দ্রনাথের মনে করেন, জগতের ধূলিকণা, জলকণা থেকে শুরু করে সকল বস্তু এক ও অদ্বিতীয় আনন্দময় সত্তার প্রকাশ। এই আনন্দময় ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হলে দুঃখ দুঃখ রূপে, মৃত্যু বিনাশ রূপে এবং জরা ব্যাধি কষ্ট রূপে অনুভূত হয়। এগুলিকে পরমসত্তার অঙ্গীভূত রূপে অনুভব করলে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু সবকিছুই আনন্দের উপাদান হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

"তোমারও অসীমে প্রাণ মন লয়ে যত দূরে আমি যাই
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই।
মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ সে হয় দুঃখের কুপ,
তোমার হতে যাবে স্বতন্ত্র হয়ে আপনার পানে চাই।"[১৮]

রবীন্দ্রনাথের মতে, মানুষ তার সীমিত জ্ঞান ও বুদ্ধির জন্য জগতের সর্বত্র এই আনন্দকে উপলব্ধি করতে পারে না বরং সে অসীম আনন্দের পরিবর্তে অমঙ্গলের অস্তিত্ব অনুভব করে থাকে। কিন্তু অখন্ড বা অসীম দৃষ্টি জাগ্রত হলে সেই অসীম পরমানন্দকে সে উপলব্ধি করতে পারে। পরমসত্তার মধ্যে অমঙ্গলের কোন স্থান থাকতে পারে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সীমিত দৃষ্টিতে, অমঙ্গলের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তিনি আরও বলেন, অমঙ্গল আমাদের বেদনার্ত করে, যন্ত্রণাক্লিষ্ট করে। কিন্তু মানুষ যখন উপলব্ধি করে, এই বেদনা ও যন্ত্রণা তার উন্নত জীবনলাভের সহায়ক, তখন সেই বেদনা ও যন্ত্রণা আনন্দরসে সিঞ্চিত হয়ে ওঠে এবং পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠে অর্থাৎ মনুষ্যজীবনে অমঙ্গল তখনই প্রকৃত অমঙ্গল হয়ে ওঠে, যখন তাকে সীমাবদ্ধ আমিত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে অনুভব করা হয়। এই আংশিক দৃষ্টি পরিত্যাগ করে সমগ্রের দৃষ্টিতে অমঙ্গলকে গ্রহণ করলে অমঙ্গলের সমস্যাটি দূরীভূত হয়। সেজন্য উপনিষদের ঋষিরা বলেছেন,

"অসতো মা সদগময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাহমৃতং গময়েতি।"[১৯]

উপনিষদে এইভাবে অমঙ্গল থেকে মঙ্গলের উপনীত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। একইভাবে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের বাণী অনুসরণ করে অসৎ থেকে সৎ এ, অন্ধকার থেকে আলোতে এবং মৃত্যু থেকে অমৃতে উত্তীর্ণ হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। এই প্রসঙ্গে আবু সয়ীদ আইয়ুব বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, ব্রহ্মের কঠোর তপস্যা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জড় থেকে প্রাণ ও মনের দিকে, অশুভ থেকে শুভের দিকে, অপূর্ণ থেকে পূর্ণের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।"[২০] তাঁর মতে, অমঙ্গলগুলি তথা ব্যথা-বেদনা, দুঃখ-কষ্ট, মৃত্যু এগুলির উপস্থিতি সত্ত্বেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব অক্ষুন্ন থাকে। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরবাদীদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অমঙ্গলের যে চিরায়ত সমস্যা দার্শনিক সমাজে যুগ যুগ ধরে বিদ্যমান তার সমাধান করেছেন এবং দেখানোর চেষ্টা করেছেন জগতে অমঙ্গলের বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে এবং সেই অমঙ্গলের বাস্তবতা পরমসত্তার স্বরূপ ও অস্তিত্বকে কোনভাবেই ক্ষুন্ন করতে পারে না। অর্থাৎ জগতে প্রাকৃতিক অমঙ্গলের সঙ্গে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কোনো অসঙ্গতি থাকতে পারে না।

তথ্যসূত্র:

১) বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলেশ। *বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দর্শন*। প্রথম সংস্করণ প্রকাশক, সদেশ, ১০১ সি বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা-৬, ১৪১১, পৃষ্ঠা ৫৬।

২) Fankenberg, Rechard. History of Modern Philosophy. Prograssive Publishers, Kolkata, 1957, Page 308.

৩) Macgregor, G. Introduction to Religious Philosophy. Boston, 1959, Page 270.

৪) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *রবীন্দ্র রচনাবলী* (নৈবেদ্য-২৬)। খন্ড-৪, সুলভ সংস্করণ। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা-১৭, ১৩৯৪, পৃষ্ঠা ২৭৯।

৫) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *গীতবিতান। ২২৩ নং গান।* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৩৩৯, পৃষ্ঠা ৯৮।

৬) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *রবীন্দ্র রচনাবলী* (ধর্ম, দুঃখ নামক প্রবন্ধ) / খন্ড-৭, সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা-১৭, ১৩৯৫, পৃষ্ঠা ৪৯০।

৭) পাল, চৌধুরী। কল্পনা। *রবীন্দ্র দর্শনে মুক্তিভাবনা।* পুস্তক বিপণী, কলকাতা ৯, ২০০৬, পৃষ্ঠা ৫৫।

৮) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *গীতবিতান। স্বদেশ, ৪২ নং গান।* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ। কলকাতা, ১৩৩৯, পৃষ্ঠা ২৬৫।

৯) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *রবীন্দ্র রচনাবলী* (আত্মপরিচয়-৩), খন্ড-১৪। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা-১৭, ১৩৯৬, পৃষ্ঠা ১৫৬।

১০) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *ছিন্নপত্র।* (পত্রসংখ্যা ১২৩)। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় বিভাগ, কলকাতা, ১৩১৯, পৃষ্ঠা ২৭৭।

১১) Tagore, Rabindranath. *Sadhana.* Mac Millian Co, New York, 1915, page-32.

১২) Roy, Binay Gopal. *The Philosophy of Rabindranath Tagore.* Progressive Publishers, Kolkata, 1949, page- 62.

১৩) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *চিঠিপত্র*, খন্ড-৩, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৩৪৯, পৃষ্ঠা ১৩-১৪

১৪) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *রবীন্দ্র রচনাবলী* (গীতালি ৩৮), খন্ড-৬। সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৩৯৫, পৃষ্ঠা ১৯।

১৫) Tagore, Rabindranath. *Sadhana.* Mac Millian Co, New York, 1915, page-30.

১৬) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *গীতবিতান* (পূজা-২৪৮)। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৩৩৯, পৃষ্ঠা ১০৮।

১৭) স্বামী গম্ভীরানন্দ। *উপনিষদ গ্রন্থাবলী* (৩ ভাগ)। বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৬//৩//৬। চতুর্থ সংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৩৭৩, পৃষ্ঠা ৪।

১৮) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *রবীন্দ্র রচনাবলী* (নৈবেদ্য-১৪), খন্ড-৪। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা-১৭, ১৩৯৪, পৃষ্ঠা ২৭২।

১৯) স্বামী গম্ভীরানন্দ। *উপনিষদ গ্রন্থাবলী* (৩ ভাগ)। বৃহদারণ্যক উপনিষদ ১//৩//২৮, চতুর্থ সংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৩৭৩, পৃষ্ঠা।

২০) আইয়ুব, আবু সয়ীদ। *আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ।* দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ১৯৬৮, পৃষ্ঠা ২৪।